অধ্যায় ৩ ঃ উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৩.২ পরিচিতি

৩.৩ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

৩.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

৩.৩.২ উপন্যাস-পরিচয়

৩.৪ কাহিনিসার

৩.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৩.৬ অতিরিক্ত পঠন

৩.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৩.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে বা বুঝতে পারবেন—

- সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও রচনার কথা জানতে পারবেন
- *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কাহিনী সম্বন্ধে জানবেন।

৩.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়টি বাংলা উপন্যাসের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা* নামক বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। *কপালকুণ্ডলা* প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। তখন বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে সবে। কাজেই *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাববস্তু, ইতিহাসের উপাদান, চরিত্র-বিচার ইত্যাদি বিষয়ে আপনাদের ধারণার সাহায্যের জন্য এখানে যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল— এর কাহিনি ও ভাষা-বিন্যাস। তাই প্রথমে আপনারা মূল উপন্যাসটি অত্যন্ত মনোযোগ সহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন। এরপার আমাদের উল্লেখিত সূচি অনুযায়ী এর বিশ্লেষণের দিকটিতে অগ্রসর হবেন।

৩.৩ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

এই অংশে আমরা উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে আলোকপাত করব। তবে এই

আলোকপাত স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা ভালো— বঙ্কিমচন্দ্র ঃ জীবনকথা ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-পরিচিতি। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন প্রসঙ্গে।

৩.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র; যথাক্রমে— শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র ('বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এবং 'পালামৌ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচক), বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ছয় বছর বয়সে মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়; কেননা পিতা যাদবচন্দ্র তখন ওখানে কর্মরত। মেদিনীপুরে চার বছর পড়াশোনা করে ১৮৪৯-এ তিনি হুগলিতে ভর্তি হন। ওই সময় (১৮৪৯) তাঁর বিয়েও দেওয়া হয়। পাত্রী কাঁঠালপাড়ার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের পাঁচ বছর বয়সী এক বালিকা। তখনও বাল্যবিবাহের যুগ। কিন্তু বিয়ে করা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন যথারীতি চলতে থাকে। হুগলি কলেজে তিনি ১৮৪৯-এর ২৩ অক্টোবর ভর্তি হন এবং ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। পড়ে ১৮৫৬-তে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই থেকে ১৮৫৭-র এপ্রিল মাসপর্যন্ত কলকাতায় পড়াশোনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এন্ট্রান্স ও বিএ পাশ করেন। উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক ছিলেন। ১৮৮৫-তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগেও ভর্তি হন।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের শুরু। ওই বছর তিনি যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। যশোহরে থাকাকালীন তাঁর প্রথম পত্নীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। ১৮৬০-এ তিনি মেদিনীপুরের নেগুঁয়া মহকুমার (বর্তমান কাঁথি) বদলি হন। এখানে কর্মরত অবস্থায় হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়।

নেগুঁয়া সমুদ্র ও অরণ্যবেষ্টিত জায়গা। এই সমদ্র, তার বালিয়াড়ি ও অরণ্য-প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলেই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। 'কপালকুণ্ডলা'-র পটভূমি, নদী-তট, নিবিড় অরণ্য, কাপালিক ইত্যাদির সঙ্গে নেগুঁয়ার স্পষ্ট মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র জানিয়েছেন, নেগুঁয়ায় থাকাকালীন এক সন্ন্যাসী কাপালিক মাঝেমধ্যে গভীর রাত্রিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করত।

যা হোক, এরপর তিনি খুলনায় বদলি হন এবং ওখানেই তাঁর প্রথম সার্থক

উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* রচনা শুরু করেন। ১৮৬৪-তে তিনি চল্লিশ পরগণার বারুইপুরে বদলি হন এবং ১৮৬৯ —এই কয়েক বছরের মধ্যেই রচিত হয় তাঁর *কপালকুণ্ডলা* ও *মৃণালিনী* উপন্যাস।

১৮৭২ খিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর *বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কমলাকান্তের দপ্তর* ইত্যাদি বিখ্যাত সব রচনা প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি বহরমপুরে কর্মরত। ১৮৪৭-এ তিনি বারাণসীতে বদলি হন। এরপর স্বাস্থ্যজনিত কারণে কয়েকমাস অবসর যাপন করেন। *কৃষ্ণকান্তের উইল* এই সময়ের রচনা। ১৮৮০-তে তিনি চুঁচুড়ায় থাকাকালীন *আনন্দমঠ* রচনা করেন।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি ঘোরতর অসুস্থ হন এবং এপ্রিলের ৮ তারিখ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ছাপান্ন বছর হয়েছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ১ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন কোথায় কীভাবে শুরু হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন কবে শুরু হয়?

.....

৩.৩.২ উপন্যাস-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাল্যরচনা একটি কবিতা। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায়। এবং ওই বছর ২৩ এপ্রিল তাঁর প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন *Raj Mohan's Wife*। এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ভাষা, কাহিনি, বুনন, ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র চিত্রায়ন ইত্যাদি সমেত এটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন রূপে চিহ্নিত হয়। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা*। এখানেও বঙ্কিম-প্রতিভা চূড়ান্ত রূপে বিকশিত হয়েছে।

আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের একটি তালিকা তুলে ধরলাম। তালিকাটি কালানুক্রমিক প্রকাশকালসহ প্রদত্ত হল— *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫),

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *সীতারাম* (১৮৮৭)।

এই অধ্যায়ে আমরা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সম্যক পরিচয় ও উপন্যাসটির উৎস সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে উপন্যাসটির বিষয়, ঘটনা ও নেপথ্য-কাহিনি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ *কপালকুণ্ডলা* কবে প্রকাশিত হয়?

.....



আপনাদের করণীয় — ৩.১

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-কথা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সূচনা ও বিবর্তন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন এবং প্রসঙ্গত *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের স্থান নির্ধারণ করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

৩.৪ কাহিনিসার

গঙ্গাসাগরে স্নান সেরে মাঘ মাসের শেষ রাত্রিতে একটি যাত্রীবাহী নৌকা ফিরছিল। বঙ্কিমের ভাষায়— কাহিনি প্রায় দুইশ পঞ্চাশ বছর আগের। চারদিক কুয়াশায় পূর্ণ। মাঝিরা দিক নির্ণয় করতে পারেনি। তাই নৌকা স্রোতের টানে কোন দিকে যাচ্ছে— বোঝেনি তারা। প্রবল স্রোতের টানে যদি মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়ে তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাত্রীরা সকলেই উৎকণ্ঠিত। একমাত্র নবকুমার বলে এক যুবক যাত্রী নিরুদ্বেগ। তাঁর মৃত্যুভয় নেই। সকলকে তিনিই সাহস দিচ্ছিলেন। এদিকে ভোর হয়েছে। আচমকা রোদ উঠেছে। রোদের কিরণে কুয়াশা কেটে গেল। দেখা গেল তারা রসুলপুরের মোহনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে পার দেখা যায়, অন্যদিকে পার নেই— শুধু জলরেখা। আর এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই ভেবে মাঝিরা কাছাকাছি নদীতীরে

নৌকা বাঁধল। যাত্রীরাও স্নানাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করল। রান্নাবান্নার জন্য কাঠ চাই। নৌকায় জ্বালানি কাঠ নেই। সামনের বন থেকে আনতে হবে। কিন্তু বাঘের ভয়ে কেউই সেখানে যেতে রাজি নয়। অবশেষে নবকুমার নামক সেই সাহসী যুবাযাত্রী একাই কুঠার হাতে নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলের দিকে গেলেন। এদিকে জোয়ার এল। যাত্রীরা নবকুমারকে ফেলেই স্রোতের অনুকূলে নৌকা ছেড়ে দিল। অনেক যাত্রী ভাবলেন হয়তো নবকুমার বাঘের পেটেই গেছে।

এদিকে নবকুমার ফিরে এসে দেখলেন যে নৌকা তাঁকে রেখেই চলে গেছে। হতাশ নবকুমার এদিকে-ওদিকে নৌকাটির খোঁজে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। বহু সময় ধরে তিনি তীরে হাঁটলেন। অবশেষে সেই জনমানবশূন্য বালিয়াড়িতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়ে রইলেন। ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র কালো অবগুণ্ঠন। হঠাৎ নবকুমারের চোখে পড়ল— দূরে একটি অস্পষ্ট আলোকবিন্দু। নবকুমার আলোর সন্ধান পেয়ে মানুষ আছে ভেবে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ক্রমে আলোর কাছাকাছি এসে দেখলেন— একটি ধুনি জ্বালিয়ে এক ভীষণদর্শন কাপালিক ধ্যানমগ্ন। কাপালিকের ধ্যান ভাঙল। নবকুমারের কথা থেকে কাপালিক বুঝলেন— পথিক ক্ষুধার্থ এবং ব্রাহ্মণ। যা হোক, সে-রাত্রির মতো আশ্রয় পেয়ে নবকুমার কাপালিকের কেয়াপাতার কুটিরেই কাটালেন। পরদিন নবকুমারের সন্দেহ হল যে কাপালিকের উদ্দেশ্য অন্য। নবকুমার কাপালিককে দেখতে পেলেন না। এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরির সময় দেখলেন বনমধ্যে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী। যুবতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল— 'পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?' যুবতী তাঁকে কুটিরে পৌঁছে দিল। নবকুমার সেদিনের মতো ওইখানেই রাত্রি যাপন করলেন। তারপরের দিনও কেটে গেল। রাত্রে কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের পথে চলল। আগে কাপালিক, পেছনে নবকুমার। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আচমকা নবকুমারের কানে ভেসে এল এক নারীকণ্ঠ— 'পথিক, পালাও— তুমি কি জানো না, নরমাংস না-হলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না।' কাপালিকও বুঝলেন— নবকুমার তাঁর আসল উদ্দেশ্য জেনে গেছেন। কাপালিক তাই বলশালী হাতে নবকুমারের হাত চেপে ধরে পূজাস্থানে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে বনের লতাপাতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখলেন। নবকুমারের মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি যখন বুঝলেন— বলের দিক দিয়ে তিনি শক্তিশালী কাপালিকের কাছে পরাজিত এবং তার কবল থেকে মুক্ত হতে পারবেন না— তখন তাঁর জন্মভূমি, পরিবার-পরিজন —সকলের মুখ মনে পড়ল। অসহায় নবকুমারের চোখ দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে শুকনো বালিতে পড়ে মিশে গেল। এদিকে পূজা শেষ করে কাপালিক যখন খড়্গ নিতে গেল, তখন দেখল খড়্গ নেই। খড়্গটা কাপালিকের পালিতা সেই যুবতী কপালকুণ্ডলা সরিয়েছিল। কপালিক খড়্গের খোঁজে এদিকে-ওদিকে যেতেই কপালকুণ্ডলা লতা কেটে নবকুমারকে মুক্ত করে তাঁকে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটল। নবকুমারও নেই, কপালকুণ্ডলাও নেই— কাপালিক পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একটা উঁচু বালির ঢিবিতে উঠে তাকাতে গিয়ে টাল সামলাতে না-পেরে ওখান থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ল এবং বালিচাপা পড়ে আহত হল।

এদিকে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে নিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বহুদূরে এক কালীমন্দিরে এসে উপস্থিত হল। মন্দিরের অধিকারী সব শুনে বুঝলেন— কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়েই বিপন্ন। এদের বাঁচানোর জন্য তিনি নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিলেন দেবী মা-কে সাক্ষী রেখে।

নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে নবকুমার স্বদেশের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর বাড়ি নবগ্রাম। পথে যেতে যেতে এক পান্থশালায় মতিবিবির সঙ্গে দেখা। নবকুমার বুঝতেই পারলেন না, এই মতিবিবি তাঁরই প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। তিনি শুধু জানলেন, মতিবিবি বর্ধমানে যাচ্ছে। কপালকুণ্ডলাকে দেখে মতিবিবির রূপের গর্ব ভেঙে গেল। নিজের মূল্যবান গয়নাগুলো সে কপালকুণ্ডলাকে পরিয়ে দিল। কপালকুণ্ডলা আশৈশব বনে পালিতা। অলংকারের লোভ তার ছিল না। সে অবাক হয়ে গেল। সে জানতেও পারল না যে মতিবিবি তারই সতিন। আসলে, মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর নবকুমারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তখনও জাগ্রত ছিল। নবকুমারকে সে ভোলেনি। ঘটনাচক্রে সে মুসলমান হয়েছিল এবং আগ্রার মোগল হারেম পর্যন্ত তার যাতায়াত গড়ে উঠেছিল।

যা হোক, কপালকুণ্ডলা তো সমাজ-পরিবার, স্বামী-সংসার —জীবনের এই দিকগুলো কিছুই জানে না। সে পথে মতিবিবি অলংকারগুলো ভিক্ষুককেই দিয়ে দিল। সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে আসার নবকুমারকে ফিরে পেয়ে তাঁর মা আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁরা তো পুত্রের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এদিকে পুত্রের সঙ্গে নতুন পুত্রবধূকে পেয়েও তাঁরা অবাক। কপালকুণ্ডলা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করলেন। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরীর বয়সও কপালকুণ্ডলারই মতো। সে কপালকুণ্ডলাকে সাজিয়ে-পরিয়ে সমাজ-সংসারে আরও নিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার ভাবাবেগ নেই। তার মনে তখনও সেই বনের আরণ্যক আদিম জীবন জাগরূক। কপালকুণ্ডলার নতুন নাম হল 'মৃন্ময়ী'। কপালকুণ্ডলার মনের কোনো পরিবর্তন হল না দেখে শ্যামাসুন্দরী তার কারণ জানতে চাইল। শুনল, বিয়ের সময়— শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র দিয়েছিল কপালকুণ্ডলা— কিন্তু তা পড়ে যায়। অতএব, কপালকুণ্ডলার বিশ্বাস— এই বিয়ে সুখের হবে না।

এদিকে মতিবিবি বর্ধমানে উপস্থিত হল। সে মোগল যুবরাজ সেলিমের প্রতি প্রণয়াসক্ত। অথচ সেলিম মেহেরুন্নিসার প্রতি আকৃষ্ট। এই কথা মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী জানত। তাই তার বর্ধমানে আগমন। ভারতের সম্রাজ্ঞী কে হবে— সেই সংশয় হাতেকলমে সে নিরসন করতে চায়। মেহের ও মতি সখী। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল মেহের বিবাহিতা হলেও সেলিমের প্রতি অনুরাগিণী। সেলিমকে জানাল তার পূর্ব স্বামী নবকুমারকে সে ফিরে পেতে চায়। সেলিম অনুমতি দিলেন। আগ্রায় মতিবিবিকে সবাই জানত লুৎফউন্নিসা নামে। সেই পরিচয় থেকে ফিরে এল সে। নয়া রূপে, নয়া বেশে। তার স্বামীগৃহ নবগ্রামে এসে উপস্থিত হল মতিবিবি বা পদ্মাবতী। নবকুমারকে সে চায়। যে-কোনো ভাবে। ধনের গর্ব, রূপের গর্ব সে ত্যাগ করে এসেছে শুধু নবকুমারের জন্য। কিন্তু নবকুমার কঠোর; নীতিবাদী। মতিবিবি পরস্ত্রী। তাছাড়া ঘরে ধর্মপত্নী 'মৃন্ময়ী' ওরফে কপালকুণ্ডলা।

নবকুমারকে তাই মতিবিবি কোনো প্রকারেই বশ করতে পারল না। তখন মতিবিবি

নিজের পরিচয় তুলে ধরল। সে পদ্মাবতী, যবনী নয়। নবকুমারের সঙ্গে তার একদা বিবাহ হয়েছিল। তার পিতা মোঘল দরবারে নিজের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হন। এবং সেই থেকেই পদ্মাবতী 'মতিবিবি'-তে পরিণত। নিজের রূপ ও ব্যক্তিত্বে মতিবিবি আগ্রায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করেছিল। জীবনে সে যা চেয়েছে তা পেয়েছে বলতে গেলে। কিন্তু কোথাও যেন একটা নিঃসঙ্গতা, অপ্রাপ্তির বেদনা কাজ করছিল। তাই নবকুমারকে আবার ফিরে পেতে সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অথচ সেই নবকুমার তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

নবকুমারের প্রত্যাখ্যানকে সহজে নিতে পারল না পদ্মাবতী। যার জন্য নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন— সেই কপালকুণ্ডলাকেই নবকুমারের জীবন থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করল। এখানে তার ঈর্ষা প্রকট হল। এদিকে প্রতিঘাতের আশায় ভগ্নস্বাস্থ্য সেই কাপালিক নবকুমারের বাড়ির পেছন দিকের জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছিল। কাপালিককে ওখানে দেখেই মতিবিবি বুঝল— কাপালিক কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ করতে সচেষ্ট। দুইয়ে দুইয়ে চার। কাপালিক ও মতিবিবি উভয়েই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এদিকে, ননদ শ্যামাসুন্দরীর স্বামী তাকে ভালোবাসত না। তার জন্য বশীকরণ ঔষধ আনতে কপালকুণ্ডলাও বনের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং সেখানেই পুরুষবেশী মতিবিবিকে সে দেখতে পায়। পরে কাপালিক ও মতিবিবির কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে সে বুঝল মৃত্যু তার দ্বারে উপস্থিত। অন্যদিকে, কাপালিকের কৌশলে নবকুমার পত্নীকে সন্দেহ করেন। অনুযোগ করেন— কপালকুণ্ডলা সাংসারিক জ্ঞানহারা। কাপালিক নবকুমারকে মাদক সেবন করায়। নবকুমারের উত্তেজিত প্রশ্নেও কপালকুণ্ডলা স্থির, অচঞ্চল। ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া তার কোনো গতি থাকে না। সে জলে পড়ে যায়। নবকুমার তাকে বাঁচাতে নিজেও ঝাঁপ দেন। কাউকেই আর পাওয়া যায়নি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ কাপালিকের কবলে নবকুমারের যে-ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল সে কোথায় এবং কেন?

.....



আপনাদের করণীয়— ৩.২

মতিবিবির কথা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে কোন্ প্রসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৩.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়টিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে অবহিত হলেন।
- বঙ্কিম তাঁর সাহিত্য-জীবনে কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে *কপালকুণ্ডলা* নামক অভূতপূর্ব উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন — তা জানলেন।
- *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি সম্বন্ধেও জানলেন।



৩.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) বাগচী, শশাঙ্কশেখর (সম্পাঃ); *কপালকুণ্ডলা।*
২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।*
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।*
৪) ভট্টাচার্য, অরূপকুমার; *উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র।*
৫) সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র; *বঙ্কিমচন্দ্র।*



৩.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন শুরু হয় ছয় বছর বয়সে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে; মেদিনীপুরে। ওখানে চার বছর অধ্যয়ন করে তিনি ১৮৪৯-এ হুগলিতে ভর্তি হন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চাকরিসূত্রে খুলনায় থাকাকালীন তাঁর উপন্যাস রচনার শুরু। প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)। *তবে সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় তাঁর বাল্যরচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের নাম *দুর্গেশনন্দিনী*। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিকের কবলে নবকুমার বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এক সমুদ্র-সৈকতে

পড়েছিলেন। কাপালিক তাঁকে ভবানীর পূজায় বলি দিতে চেয়েছিল। কেননা তার বিশ্বাস ভবানীই নবকুমারকে তার কাছে পাঠিয়েছেন। আর মনুষ্য বলির মধ্যে দিয়ে সে পরম শক্তির অধিকারী হবে।



৩.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের উৎস ও বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা প্রস্তুত করুন।

*** ***** ***